অনাথবাবুর ভয়

অনাথবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ ট্রেনের কামরায়। আমি যাচ্ছিলাম রঘুনাথপুর হাওয়াবদলের জন্য। কলকাতায় খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করি। গত ক-মাস ধরে কাজের চাপে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তাছাড়া আমার লেখার শখ, দু-একটা গল্পের প্লটও মাথাও ঘুরছিল, কিন্তু এত কাজের মধ্যে কি আর লেখার ফুরসত জোটে? তাই আর সাত-পাঁচ না ভেবে দশদিনের পাওনা ছুটি আর দিস্তেখানেক কাগজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এত জায়গা থাকতে রঘুনাথপুর কেন তারও অবিশ্যি একটা কারণ আছে। ওখানে বিনা-খরচায় থাকার একটা ব্যবস্থা জুটে গেছে। আমার কলেজের সহপাঠী বীরেন বিশ্বাসের পৈতৃক বাড়ি রয়েছে রঘুনাথপুরে। কফি হাউসে বসে, ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায়, এই আলোচনাপ্রসঙ্গে বীরেন খুব খুশি হয়ে ওর বাড়িটা অফার করে বলল, 'আমিও যেতুম, কিন্তু আমার এদিকের ঝামেলা, বুঝতেই তো পারছিস। তবে তোর কোনোই অসুবিধা হবে না। আমাদের পঞ্চাশ বছরের পুরনো চাকর ভরদ্বাজ রয়েছে ও-বাড়িতে। ও-ই তোর দেখাশুনো করবে। তুই চলে যা।'

গাড়িতে যাত্রী ছিল অনেক। আমার বেঞ্চিতে আমারই পাশে বসে ছিলেন অনাথবন্ধু মিত্র। বেঁটেখাটো মানুষটি, বছর পঞ্চাশেক আন্দাজ বয়স। মাঝখানে টেরিকাটা কাঁচাপাকা চুল, চোখের চাহনি তীক্ষ্ণ, আর ঠোঁটের কোণে এমন একটা ভাব যেন মনের আনাচেকানাচে সদাই কোনো মজার চিন্তা ঘোরাফেরা করছে। পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও একটা বিশেষত্ব লক্ষ করলাম: ভদ্রলোককে হঠাৎ দেখলে মনে হবে তিনি যেন পঞ্চাশ বছরের পুরনো কোনো নাটকের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সেজেগুজে তৈরি হয়ে এসেছেন। ওরকম কোট, ও ধরনের শার্টের কলার, ওই চশমা, আর বিশেষ করে ওই বুট জুতো—এসব আর

suman_ahm@yahoo.com

আজকালকার দিনে কেউ পরে না।

অনাথবাবুর সঙ্গে আলাপ করে জানলাম তিনিও রঘুনাথপুর যাচ্ছেন। কারণ জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কিংবা এও হতে পারে যে ট্রেনের শব্দের জন্য তিনি আমার প্রশ্ন শুনতে পাননি।

বীরেনের পৈতৃক ভিটেটি দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠল। বেশ বাড়ি। সামনে একফালি জমি—তাতে সবজি ও ফুলগাছ দুই-ই হয়েছে। কাছাকাছির মধ্যে অন্য কোনো বাড়িও নেই, কাজেই পড়শীর উৎপাত থেকেও রক্ষা।

আমি আমার থাকার জন্য ভরদ্বাজের আপত্তি সত্ত্বেও ছাতের চিলেকোঠাটি বেছে নিলাম। আলো বাতাস এবং নির্জনতা, তিনটেই অপর্যাপ্ত পাওয়া যাবে ওখানে। ঘর দখল করে জিনিসপত্র গোছাবার সময় দেখি আমার দাড়ি কামানোর ক্ষুর আনতে ভুলে গিয়েছি। ভরদ্বাজ শুনে বলল, 'তাতে আর কী হয়েছে খোকাবাবু। এই তো কুণ্ডুবাবুর দোকান, পাঁচ মিনিটের পথ। সেখানে গেলেই পাবে'খন বিলেড।'

বিকেল চারটে নাগাদ চা-টা খেয়ে কুণ্ডুবাবুর দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি সেটি একটি ভালো আড্ডার জায়গা। দোকানের ভিতর দুটি বেঞ্চিতে বসে পাঁচ-সাতটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক রীতিমতো গল্প জমিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বেশ উত্তেজিতভাবে বলছেন, 'আরে বাপু, এ তো আর শোনা কথা নয়। এ আমার নিজের চোখে দেখা। আর তিরিশ বছর হয়ে গেল বলেই কি সব মন থেকে মুছে গেল ? এসব স্মৃতি অত সহজে ভোলবার নয়, আর বিশেষ করে যখন হলধর দত্ত ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার মৃত্যুর জন্য আমি যে কিছু অংশে দায়ী, সে বিশ্বাস আমার আজও যায়নি।'

আমি এক প্যাকেট সেভন-ও-ক্লক কিনে আরো দু-একটা অবান্তর জিনিসের খোঁজ করতে লাগলাম। ভদ্রলোক বলে চললেন, 'ভেবে দেখুন, আমারই বন্ধু আমারই সঙ্গে মাত্র দশ টাকা বাজি ধরে রাত কাটাতে গেল ওই উত্তর-পশ্চিমের ঘরটাতে। পরদিন ফেরে না, ফেরে না, ফেরে না—শেষটায় আমি, জিতেন বক্সি, হরিচরণ সা, আর আরো তিন-চারজন কে ছিল ঠিক মনে নেই—গেলুম হালদারবাড়িতে হলধরের খোঁজ করতে। গিয়ে দেখি বাবু ওই ঘরের মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে মরে কাঠ হয়ে আছেন, তাঁর চোখ চাওয়া, দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে। আর সেই দৃষ্টিতে ভয়ের যা নমুনা দেখলুম, তাতে ভূত ছাড়া আর কী ভাবব বলুন ? গায়ে কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই, বাঘের আঁচড় নেই, সাপের ছোবল নেই, কিচ্ছু নেই। আপনারাই বলুন এখন কী বলবেন।'

আরো মিনিট পাঁচেক দোকানে থেকে আলোচনার বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হল। ব্যাপারটা এই—রঘুনাথপুরের দক্ষিণপ্রান্তে হালদারবাড়ি বলে

একটি দুশো বছরের পুরনো ভগ্নপ্রায় জমিদারী প্রাসাদ আছে। সেই প্রাসাদে—বিশেষ করে তার দোতলার উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি ঘরে—নাকি অনেক কালের পুরনো একটি ভূতের আনাগোনা আছে। অবশ্য সেই ত্রিশ বছর আগে ভবতোষ মজুমদারের বন্ধু হলধর দত্তের মৃত্যুর পর আজ অবধি নাকি কেউ সে বাড়িতে রাত কাটায়নি। কিন্তু তাও রঘুনাথপুরের বাসিন্দারা ভূতের অস্তিত্ব মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করে। আর বিশ্বাস করার কারণও আছে যথেষ্ট। একে তো হলধর দত্তের রহস্যজনক মৃত্যু, তার উপর এমনিতেই হালদারবংশের ইতিহাসে নাকি খুনখারাপি, আত্মহত্যা ইত্যাদির অনেক নজির পাওয়া যায়।

মনে মনে হালদারবাড়ি সম্পর্কে বেশ খানিকটা কৌতূহল নিয়ে দোকানের বাইরে এসেই দেখি আমার ট্রেনের আলাপী অনাথবন্ধু মিত্র মশাই হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় দেখে বললেন, 'শুনছিলেন ওদের কথাবার্তা ?'

বললাম, 'তা কিছুটা শুনেছি।'

'বিশ্বাস হয় ?'

'কী ? ভূত ?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাপার কী জানেন—ভূতের বাড়ির কথা তো অনেকই শুনলাম, কিন্তু সেসব বাড়িতে থেকে নিজের চোখে ভূত দেখেছে এমন লোক তো কই আজ অবধি একটিও মীট করলাম না। তাই ঠিক—'

অনাথবাবু একটু হেসে বললেন, 'একবার দেখে আসবেন নাকি ?'

'কী ?'

'বাড়িটা।'

'দেখে আসব মানে—'

'বাইরে থেকে আর কি। বেশি দূর তো নয়। বড় জোর মাইলখানেক। এই রাস্তা দিয়ে সোজা গিয়ে জোড়াশিবের মন্দির ছাড়িয়ে ডানহাতি রাস্তায় ঘুরে পোয়াটাক পথ।'

ভদ্রলোককে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল। আর তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গিয়ে কী করব ? তাই চললাম তাঁর সঙ্গে।

হালদারদের বাড়িটা দূর থেকে দেখা যায় না, কারণ বাড়ির চারপাশে বড় বড় গাছের জঙ্গল। তবে বাড়ির গেটের মাথাটি দেখা যেতে থাকে পৌঁছনোর প্রায় দশ মিনিট আগে থেকেই। বিরাট ফটক, মাথার উপর ভগ্নপ্রায় নহবতখানা। ফটকের ভিতর দিয়ে বেশ খানিকদূর রাস্তা গিয়ে তবে সদর দালান। দু-তিনটে মূর্তি আর ফোয়ারার ভগ্নাবশেষ দেখে বুঝলাম যে বাড়ির আর ফটকের

মাঝখানের এই জায়গাটা আগে বাগান ছিল। বাড়িটি অদ্ভুত। কারুকার্যের কোনো বাহার নেই তার কোনো জায়গায়। কেমন যেন একটা বেঢপ চৌকোচৌকো ভাব। বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে তার শেওলাবৃত দেয়ালে।

মিনিটখানেক চেয়ে থাকার পর অনাথবাবু বললেন, 'আমি যতদূর জানি, রোদ থাকতে ভূত বেরোয় না।' তারপর আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললেন, 'একবার চট করে সেই ঘরটা দেখে এলে হত না ?'

'সেই উত্তর-পশ্চিমের ঘর ? যে ঘরে—'

'হ্যাঁ। যে ঘরে হলধর দত্তের মৃত্যু হয়েছিল।'

ভদ্রলোকের তো এসব ব্যাপারে দেখছি একটু বাড়াবাড়ি রকমের আগ্রহ !

অনাথবাবু বোধহয় আমার মনের ভাবটা আঁচ করতে পেরেই বললেন, 'খুব আশ্চর্য লাগছে, না ? আসলে কী জানেন ? আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই—আমার রঘুনাথপুর আসার একমাত্র কারণই হল ওই বাড়িটা।'

'বটে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটা যে ভূতের বাড়ি, আমি কলকাতায় থাকতে সে খবরটা পেয়ে ওই ভূতটিকে দেখব বলে এখানে এসেছি। আপনি সেদিন ট্রেনে আমার আসার কারণটা জানতে চাইলেন। আমি উত্তর না দিয়ে অভদ্রতা করলাম বটে, কিন্তু মনে মনে স্থির করেছিলাম যে উপযুক্ত সময় এলে—অর্থাৎ আপনি কীরকম লোক সেটা আরেকটু জেনে নিয়ে, আসল কারণটা নিজে থেকেই বলব।'

'কিন্তু তাই বলে ভূতের পেছনে ধাওয়া করে একেবারে কলকাতা ছেড়ে—'

'বলছি, বলছি। ব্যস্ত হবেন না। আমার কাজটা সম্বন্ধেই তো বলা হয়নি এখনো আপনাকে। আসলে আমি ভূত সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। আজ পঁচিশ বছর ধরে এ-ব্যাপার নিয়ে বিস্তর রিসার্চ করেছি। শুধু ভূত কেন—ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, যোগিনী, ভ্যাম্পায়ার, ওয়্যারউল্ফ, ভুডুইজম ইত্যাদি যা কিছু আছে তার সম্বন্ধে বইয়ে যা লেখে তার প্রায় সবই পড়ে ফেলেছি। সাতটা ভাষা শিখতে হয়েছে এইসব বই পড়ার জন্য। পরলোকতত্ত্ব নিয়ে লন্ডনের প্রফেসার নর্টনের সঙ্গে আজ তিন বছর ধরে চিঠি লেখালেখি করছি। আমার লেখা প্রবন্ধ বিলেতের সব নামকরা কাগজে বেরিয়েছে। আপনার কাছে বড়াই করে কী লাভ, তবে এটুকু বলতে পারি যে এদেশে এ ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী লোক বোধহয় আর নেই।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে তিনি যে মিথ্যে বলছেন বা বাড়িয়ে বলছেন এটা আমার একবারও মনে হয় না। বরং তাঁর সম্বন্ধে খুব সহজেই একটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল।

অনাথবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ভারতবর্ষের অন্তত তিনশো ভূতের বাড়িতে আমি রাত কাটিয়েছি।'

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ। আর সেসব কীরকম কীরকম জায়গায় জানেন? এই ধরুন—জব্বলপুর, কার্সিয়ং, চেরাপুঞ্জি, কাঁথি, কাটোয়া, যোধপুর, আজিমগঞ্জ, হাজারিবাগ, সিউড়ি, বারাসাত, আর কত চাই? ছাপ্পান্নোটা ডাকবাংলো আর কম করে ত্রিশটা নীলকুঠিতে আমি রাত্রি যাপন করেছি। এ ছাড়া কলকাতা এবং তার কাছাকাছির মধ্যে অন্তত পঞ্চাশখানা বাড়ি তো আছেই। কিন্তু—'

অনাথবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, 'ভূত আমায় ফাঁকি দিয়েছে। হয়তো, ভূতকে যারা চায় না, ভূত তাদের কাছেই আসে। আমি বার বার হতাশ হয়েছি। মাদ্রাজে ত্রিচিনপল্লীতে দেড়শ বছরের পুরনো একটা সাহেবদের পরিত্যক্ত ক্লাব-বাড়িতে ভূত একবার কাছাকাছি এসেছিল। কীরকম জানেন? অন্ধকার ঘর, একফোঁটা বাতাস নেই, যতবারই মোমবাতি ধরাব বলে দেশলাই জ্বালাচ্ছি, ততবারই কে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছে। শেষটায় তেরোটা কাঠি নষ্ট করার পর বাতি জ্বলল, এবং আলোর সঙ্গে সঙ্গেই ভূতবাবাজী সেই যে গেলেন আর এলেন না। একবার কলকাতায় ঝামাপুকুরের এক হানাবাড়িতেও একটা ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমার মাথায় তো এত চুল দেখছেন? অথচ, ওই বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে ভূতের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে মাঝরাত্তির নাগাদ হঠাৎ ব্রহ্মতালুর কাছটায় একটা মশার কামড় খেলাম। কী ব্যাপার? অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখি একটি চুলও নেই! একেবারে মসৃণ মাথাজোড়া টাক! এ কি আমারই মাথা, না অন্য কারুর মাথায় হাত দিয়ে নিজের মাথা বলে মনে করেছি? কিন্তু মশার কামড়টা তো আমিই খেলাম। টর্চটা জ্বেলে আয়নায় দেখি টাকের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। আমার যে-চুল সে-চুলই রয়েছে আমার মাথায়। ব্যস, এই দুটি ছাড়া আর কোনো ভূতুড়ে অভিজ্ঞতা এত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হয়নি। তাই ভূত দেখার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম, এমন সময় একটা পুরনো বাঁধানো "প্রবাসী"তে রঘুনাথপুরের এই বাড়িটার একটা উল্লেখ পেলাম। তাই ঠিক করলাম একটা শেষ চেষ্টা দিয়ে আসব।'

অনাথবাবুর কথা শুনতে শুনতে কখন যে বাড়ির সদর দরজায় এসে পড়েছি সে খেয়াল ছিল না। ভদ্রলোক তাঁর ট্যাঁকঘড়িটা দেখে বললেন, 'আজ পাঁচটা একত্রিশে সূর্যাস্ত। এখন সোয়া পাঁচটা। চলুন, রোদ থাকতে থাকতে একবার ঘরটা দেখে আসি।'

ভূতের নেশাটা বোধহয় সংক্রামক, কারণ আমি অনাথবাবুর প্রস্তাবে কোনো

আপত্তি করলাম না। বরঞ্চ বাড়ির ভিতরটা, আর বিশেষ করে দোতলার ওই ঘরটা দেখার জন্য বেশ একটা আগ্রহ হচ্ছিল।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকে দেখি বিরাট উঠোন ও নাটমন্দির। একশো-দেড়শো বছরে কত উৎসব, কত অনুষ্ঠান, কত পূজা-পার্বণ, যাত্রা, কথকতা এইখানে হয়েছে, তার কোনো চিহ্ন আজ নেই।

উঠোনের তিন দিকে বারান্দা। আমাদের ডাইনে বারান্দার যে অংশ, তাতে একটি ভাঙা পালকি পড়ে আছে, এবং পালকিটি ছাড়িয়ে হাত দশেক গিয়েই দোতলায় যাবার সিঁড়ি।

সিঁড়িটা এমনই অন্ধকার যে উঠবার সময় অনাথবাবুকে তাঁর কোটের পকেট থেকে একটি টর্চ বার করে জ্বালতে হল। প্রায়-অদৃশ্য মাকড়সার জালের ব্যূহ ভেদ করে কোনোরকমে দোতলায় পৌঁছনো গেল। মনে মনে বললাম, এ বাড়িতে ভূত থাকা অস্বাভাবিক নয়।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হিসাব করে দেখলাম বাঁ দিক দিয়ে সোজা চলে গেলে ওই যে ঘর, ওটাই হল উত্তর-পশ্চিমের ঘর। অনাথবাবু বললেন, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চলুন এগোই।'

এখানে বলে রাখি, বারান্দায় কেবল একটি জিনিস ছিল—সেটি একটি ঘড়ি। যাকে বলে গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। কিন্তু তার অবস্থা খুবই শোচনীয়—কাঁচ নেই, বড় কাঁটাটিও উধাও, পেন্ডুলামটি ভেঙে কাত হয়ে পড়ে আছে।

উত্তর-পশ্চিমের ঘরের দরজাটি ভেজানো ছিল। অনাথবাবু যখন তাঁর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সন্তর্পণে ঠেলে দরজাটি খুলছিলেন, তখন বিনা কারণেই আমার গা-টা ছমছম করছিল।

কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করলাম না। দেখে মনে হয় এককালে বৈঠকখানা ছিল। ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট টেবিল, তার কেবল পায়া চারখানাই রয়েছে, উপরের তক্তাটা নেই। টেবিলের পাশে জানালার দিকে একটি আরামকেদারা। অবিশ্যি এখন আর সেটি আরামদায়ক হবে কিনা সন্দেহ, কারণ তার একটি হাতল ও বসবার জায়গায় বেতের খানিকটা অংশ লোপ পেয়েছে।

উপরের দিকে চেয়ে দেখি ছাত থেকে ঝুলছে একটি টানাপাখার ভগ্নাংশ। অর্থাৎ, তার দড়ি নেই, কাঠের ডাণ্ডাটা ভাঙা এবং ঝালরের অর্ধেকটা ছেঁড়া।

এ ছাড়া ঘরে আছে একটি খাঁজকাটা বন্দুক রাখার তাক, একটি নলবিহীন গড়গড়া, আর দু'খানা সাধারণ হাতলভাঙা চেয়ার।

অনাথবাবু কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। মনে হল খুব মনোযোগ দিয়ে কী একটা অনুভব করার চেষ্টা করলেন। প্রায় মিনিটখানেক পরে বললেন,

'একটা গন্ধ পাচ্ছেন ?'

'কী গন্ধ ?'

'মাদ্রাজী ধূপ, মাছের তেল, আর মড়াপোড়ার গন্ধ মেশানো একটা গন্ধ ।'

আমি বার দু'-এক বেশ জোরে জোরে নিশ্বাস টানলাম। অনেকদিনের বন্ধ ঘর খুললে যে একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয়, সে গন্ধ ছাড়া কোনো গন্ধই পেলাম না। তাই বললাম, 'কই, ঠিক বুঝতে পারছি না তো।'

অনাথবাবু আরো একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুঁষি মেরে বললেন, 'বহুত আচ্ছা ! এ গন্ধ আমার চেনা গন্ধ। এ বাড়িতে ভূত অবশ্যম্ভাবী। তবে বাবাজী দেখা দেবেন কি না-দেবেন সেটা কাল রাত্রের আগে বোঝা যাবে না। চলুন।'

অনাথবাবু স্থির করে ফেললেন যে, পরদিনই তাঁকে এ ঘরে রাত্রিবাস করতে হবে। ফেরার পথে বললেন, 'আজ থাকলুম না কারণ কাল অমাবস্যা—ভূতের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত তিথি। তাছাড়া দু'-একটি জিনিস সঙ্গে রাখা দরকার। সেগুলো বাড়িতে রয়ে গেছে, কাল নিয়ে আসব। আজ সার্ভেটা করে গেলুম আর কি।'

ভদ্রলোক আমায় বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার সময় গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, 'আর কাউকে আমার এই প্ল্যানের কথা বলবেন না যেন। এদের কথাবার্তা তো শুনলুম আজকে—যা ভয় আর যা প্রেজুডিস এদের, জানলে পরে হয়তো বাধাটাধা দিয়ে আমার প্ল্যানটাই ভেস্তে দেবে। আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে বললুম না বলে কিছু মনে করবেন না। এসব ব্যাপার, বুঝলেন কিনা, একা না হলে ঠিক জুতসই হয় না।'

পরদিন দুপুরে কাগজকলম নিয়ে বসলেও লেখা খুব বেশিদূর এগোল না। মন পড়ে রয়েছে হালদারবাড়ির ওই উত্তর-পশ্চিমের ঘরটায়। আর রাত্রে অনাথবাবুর কী অভিজ্ঞতা হবে সেই নিয়ে একটা অশান্তি আর উদ্বেগ রয়েছে মনের মধ্যে।

বিকেলে অনাথবাবুকে হালদারবাড়ির ফটক অবধি পৌঁছে দিলাম। ভদ্রলোকের গায়ে আজ একটা কালো গলাবন্ধ কোট, কাঁধে জলের ফ্লাস্ক আর হাতে সেই কালকের তিন সেলের টর্চ। ফটক দিয়ে ঢুকবার আগে কোটের দু' পকেটে দু' হাত ঢুকিয়ে দুটো বোতল বার করে আমায় দেখিয়ে বললেন, 'এই দেখুন—এটিতে রয়েছে আমার নিজের ফরমুলায় তৈরি তেল—শরীরের অনাবৃত অংশে মেখে নিলে আর মশা কামড়াবে না। আর এই দ্বিতীয়টিতে হল

কারবলিক অ্যাসিড, ঘরের আশেপাশে ছড়িয়ে দিলে সাপের উৎপাত থেকে নিশ্চিন্ত।' এই বলে বোতল দুটো পকেটে পুরে, টর্চটা মাথায় ঠেকিয়ে আমায় একটা সেলাম ঠুকে ভদ্রলোক বুট জুতো খটখটিয়ে হালদারবাড়ির দিকে চলে গেলেন।

রাত্রে ভালো ঘুম হল না।

ভোর হতে না হতে ভরদ্বাজকে বললাম আমার থার্মস ফ্লাস্কে দু'জনের মতো চা ভরে দিতে। চা এলে পর ফ্লাস্কটি নিয়ে আবার হালদারবাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম।

হালদারবাড়ির ফটকের কাছে পৌঁছে দেখি চারিদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। অনাথবাবুর নাম ধরে ডাকব, না সটান দোতলায় যাব তাই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম—'ও মশাই, এই যে এদিকে।'

এবার দেখতে পেলাম অনাথবাবুকে—প্রাসাদের পুবদিকের জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আমার দিকে হেঁটে আসছেন। তাঁকে দেখে মোটেই মনে হয় না যে রাত্রে তাঁর কোনো ভয়াবহ বা অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হয়েছে।

আমার কাছে এসে হাসতে হাসতে হাতে একটা নিমের ডাল দেখিয়ে বললেন, 'আর বলবেন না মশাই! আধ ঘন্টা ধরে বনেবাদাড়ে ঘুরছি এই নিমডালের খোঁজে। আমার আবার দাঁতনের অভ্যেস কিনা।'

ফস করে রাত্রের কথাটা জিজ্ঞেস করতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকল। বললাম, 'চা এনেছি। এখানেই খাবেন, না বাড়ি যাবেন?'

'চলুন না, ওই ফোয়ারার পাশটায় বসে খাওয়া যাক।'

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে একটা তৃপ্তিসূচক 'আঃ' শব্দ করে আমার দিকে ফিরে মুচকি হেসে অনাথবাবু বললেন, 'খুব কৌতূহল হচ্ছে, না?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'হ্যাঁ, মানে, তা একটু—'

'বেশ। তবে বলছি শুনুন। গোড়াতেই বলে রাখি—এক্সপিডিশন হাইলি সাক্সেসফুল। আমার এখানে আসা সার্থক হয়েছে।' অনাথবাবু এক মগ চা শেষ করে দ্বিতীয় মগ ঢেলে তাঁর কথা শুরু করলেন:

'আপনি যখন আমায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন তখন পাঁচটা। আমি বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগে এই আশপাশটা একটু সার্ভে করে নিলুম। অনেক সময় ভূতের চেয়ে জ্যান্ত মানুষ বা জানোয়ার থেকে উপদ্রবের আশঙ্কা বেশি থাকে। যাই হোক, দেখলুম কাছাকাছির মধ্যে সন্দেহজনক কিছু নেই।

'বাড়িতে ঢুকে একতলার ঘরগুলোর মধ্যে যেগুলো খোলা হয়েছে সেগুলোও একবার দেখে নিলুম। জিনিসপত্তর তো আর অ্যাদ্দিন ধরে বিশেষ পড়ে থাকার

কথা নয়। একটা ঘরে কিছু আবর্জনা, আর আরেকটার কড়িকাঠে গুটি চারেক ঝুলন্ত বাদুড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। বাদুড়গুলো আমায় দেখেও নড়ল না। আমিও তাদের ডিসটার্ব করলুম না।

'সাড়ে ছ'টা নাগাদ দোতলার ওই আসল ঘরটিতে ঢুকে রাত কাটানোর আয়োজন শুরু করলুম। একটা ঝাড়ন এনেছিলুম, তাই দিয়ে প্রথম আরামকেদারাটিকে ঝেড়েপুঁছে সাফ করলুম। কদ্দিনের ধুলো জমেছিল তাতে কে জানে?

'ঘরের মধ্যে একটা গুমোট ভাব ছিল, তাই জানালাটা খুলে দিলুম। ভূতবাবাজী যদি সশরীরে আসতে চান তাই বারান্দার দরজাটাও খোলা রাখলুম। তারপর টর্চ ও ফ্লাস্কটা মেঝেতে রেখে ওই বেতছেঁড়া আরামকেদারাতেই শুয়ে পড়লুম। অসোয়াস্তি হচ্ছিল বেশ, কিন্তু এর চেয়েও আরো অনেক বেয়াড়া অবস্থায় বহুবার রাত কাটিয়েছি, তাই কিছু মাইন্ড করলুম না।

'আশ্বিন মাস, সাড়ে পাঁচটায় সূর্য ডুবেছে। দেখতে দেখতে অন্ধকারটা বেশ জমাট বেঁধে উঠল। আর সেই সঙ্গে সেই গন্ধটাও ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি এমনিতে খুব ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, সহজে বড় একটা এক্‌সাইটেড হই না, কিন্তু কাল যেন ভেতরে ভেতরে বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলুম।

'সময়টা ঠিক বলতে পারি না, তবে আন্দাজে মনে হয় ন'টা কি সাড়ে ন'টা নাগাদ জানালা দিয়ে একটা জোনাকি ঘরে ঢুকেছিল। সেটা মিনিটখানেক ঘোরাঘুরি করে আবার জানালা দিয়েই বেরিয়ে গেল।

'তারপর কখন যে শেয়াল, ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে, আর কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি সে খেয়াল নেই।

'ঘুমটা ভাঙল একটা শব্দে। ঘড়ির শব্দ। ঢং ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। মিঠে অথচ বেশ জোর আওয়াজ। জাত ঘড়ির আওয়াজ, আর সেটা আসছে বাইরের বারান্দা থেকে।

'কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমটা ছুটে গিয়ে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে আরো দুটো জিনিস লক্ষ করলুম। এক—আমি আরামকেদারায় সত্যিই খুব আরামে শুয়ে আছি। ছেঁড়াটা তো নেইই, বরং উলটে আমার পিঠের তলায় কে যেন একটা বালিশ গুঁজে দিয়ে গেছে। আর দুই—আমার মাথার উপর একটি চমৎকার ঝালর সমেত আস্ত নতুন টানাপাখা, তা থেকে একটি নতুন দড়ি দেয়ালের ফুটো দিয়ে বারান্দায় চলে গেছে, এবং কে জানি সে দড়িতে টান দিয়ে পাখাটি দুলিয়ে আমায় চমৎকার বাতাস করছে।

'আমি অবাক হয়ে এইসব দেখছি আর উপভোগ করছি, এমন সময় খেয়াল হল অমাবস্যার রাত্তিরে কী করে জানি ঘরটা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে

উঠল। তারপর নাকে এল একটা চমৎকার গন্ধ। পাশ ফিরে দেখি কে জানি একটি আলবোলা রেখে গেছে, আর তার থেকে ভুরভুর করে বেরোচ্ছে একেবারে সেরা অম্বুরী তামাকের গন্ধ।'

অনাথবাবু একটু থামলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন, 'বেশ মনোরম পরিবেশ নয় কি ?'

আমি বললাম, 'শুনে তো ভালোই লাগছে। আপনার রাতটা তাহলে মোটামুটি আরামেই কেটেছে ?'

আমার প্রশ্ন শুনে অনাথবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বললাম, 'তাহলে কি সত্যি আপনার কোনো ভয়ের কারণ ঘটেনি ? ভূত কি আপনি দেখেননি ?'

অনাথবাবু আবার আমার দিকে চাইলেন। এবার কিন্তু আর ঠোঁটের কোণে সে হাসিটা নেই। ধরা গলায় ভদ্রলোকের প্রশ্ন এল, 'পরশু যখন আপনি ঘরটায় গেলেন, তখন কড়িকাঠের দিকটা ভালো করে লক্ষ করেছিলেন কি ?'

আমি বললাম, 'তেমন ভালো করে দেখিনি বোধহয়। কেন বলুন তো ?'

অনাথবাবু বললেন, 'ওখানে একটা বিশেষ ব্যাপার রয়েছে, সেটা না দেখলে ঘটনাটা বোঝাতে পারব না। চলুন।'

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অনাথবাবু কেবল একটি কথা বললেন, 'আমার আর ভূতের পেছনে ধাওয়া করতে হবে না সীতেশবাবু। কোনোদিনও না। সে শখ মিটে গেছে।'

বারান্দা দিয়ে যাবার পথে ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম সেরকমই ভাঙা অবস্থা।

ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে অনাথবাবু বললেন, 'চলুন।'

দরজাটা ভেজানো ছিল। আমি হাত দিয়ে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। তারপর দু'পা এগিয়ে মেঝের দিকে চোখ পড়তেই আমার সমস্ত শরীরে একটা বিস্ময় ও আতঙ্কের শিহরন খেলে গেল।

বুট জুতো পরা ও কে পড়ে আছে মেঝেতে ?

আর বারান্দার দিক থেকে কার অট্টহাসি হালদারবাড়ির আনাচেকানাচে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার রক্ত জল করে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি-চিন্তা সব লোপ পাইয়ে দিচ্ছে ? তাহলে কি— ?

আর কিছু মনে নেই আমার।

যখন জ্ঞান হল, দেখি ভরদ্বাজ আমার খাটের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমায় হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন ভবতোষ মজুমদার। আমায় চোখ খুলতে দেখে ভবতোষবাবু বললেন, 'ভাগ্যে সিধুচরণ আপনাকে দেখেছিল ও

বাড়িতে ঢুকতে, নইলে যে কী দশা হত আপনার জানি না। ওখানে গেস্‌লেন কোন্ আক্কেলে?'

আমি বললাম, 'অনাথবাবু যে রাত্রে—'

ভবতোষবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'আর অনাথবাবু! কাল যে অতগুলো কথা বললুম সেসব বোধহয় কিছুই বিশ্বাস করেননি ভদ্রলোক। ভাগ্যে আপনিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাত কাটাতে যাননি ও বাড়িতে। দেখলেন তো ওঁর অবস্থা। হলধরের যা হয়েছিল, এঁরও ঠিক তাই। মরে একেবারে কাঠ, আর চোখ ঠিক সেইভাবে চাওয়া, সেই দৃষ্টি, সেই কড়িকাঠের দিকে।...'

আমি মনে মনে বললাম, না, মরে কাঠ নয়। মরে কী হয়েছেন অনাথবাবু তা আমি জানি। কালও সকালে গেলে দেখতে পাব তাঁকে—গায়ে কালো কোট, পায়ে বুট জুতো—হালদারবাড়ির পুব দিকের জঙ্গল থেকে নিমের দাঁতন হাতে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছেন।

suman_ahm@yahoo.com
For More Books Visit www.murchona.com
Murchona Forum : http://www.murchona.com/forum/index.php